OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 140 - 146
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 140 - 146
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

‘প্রত্যহের একদিন’ ও ‘ঘরের কথা’ : দৈনন্দিন সাধারণ গৃহজীবনের অসাধারণ আখ্যান

বর্ণালী পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
Email ID : pal.barnali0015@.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Prabhat Devsarkar, Mihir mukhopadhyay, Short Story, Narrator, ‘Desh’ Magazine Common life, Daily Life, extraordinaryness in ordinary life.

Abstract
One of two storytellers of the 20th century were Prabhat Devsarkar and Mihir Mukhopadhyay. Many of their stories were published in many eminent magazines and little magazines of that time. Besides short stories, they also wrote several novels. But inspite of writing so much in so many magazines for a long period of time, they did not get that much recognition in that time. In fact, due to the lack of collection of stories and scarcity of other books, there is no such discussion about their literature even now. Prabhat Devsarkar and Mihir Mukhopadhyay's short stories can also be said to be less discussed. In the present article, after introducing these two forgotten storytellers, we have discussed two of their stories. Both the stories were published in 'Desh' magazine in alomost similar time. In Prabhat Devsarkar's story 'Pratyaher Ekdin', the picture of the everyday life of the lower middle class is vivid. And Mihir Mukhopadhyay's 'Gharer Katha' is actually the story of the common life of the rural people. Our discussion is about the extraordinaryness of this ordinary life reflected in the above stories.

Discussion

বহুল প্রচলিত ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রায় সমসময়ে প্রকাশিত হয় অধুনা বিস্মৃতপ্রায় দুইজন গল্পকার— যথাক্রমে প্রভাত দেবসরকার এবং মিহির মুখোপাধ্যায়ের ‘প্রত্যহের একদিন’ (১১ বৈশাখ ১৩৮৩) ও ‘ঘরের কথা’ (২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩) গল্প দুটি। আমাদের আলোচ্য প্রথম গল্প ‘প্রত্যহের একদিন’-এর লেখক প্রভাত দেবসরকারকে একটি গল্প সংকলনের লেখক পরিচিতি অংশে ‘একসময়ের জনপ্রিয় লেখক’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ হল— ‘অকুলকন্যা’ (৭ কার্তিক ১৩৬১), ‘কন্যাকাল’ (শ্রাবণ ১৩৬২), ‘অভিযান’, ‘মথুরা নগরে’, ‘রাজার রাজা’ ইত্যাদি। অন্যদিকে ‘ঘরের কথা’ গল্পের লেখক মিহির মুখোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ নাম হল মিহিরমোহন মুখোপাধ্যায়। পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার কলসকাঠি গ্রামে ১৯৩২ সালের ৭ জানুয়ারি (মতান্তরে ১ ফেব্রুয়ারি)[২] মিহির মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। দিদিমা শিবদাসী দেবী চৌধুরানী এবং পিতা মুরারিমোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রণোদনায় শৈশবেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তৈরি হয় তাঁর। দিদিমার মুখে রামায়ণ, মহাভারত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 140 - 146
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শুনতে শুনতে ক্রমে অক্ষরজ্ঞান হলে 'দেব সাহিত্য কুটীর' থেকে প্রকাশিত পূজাবার্ষিকী এবং 'শিশুসাথী'-র পাঠক মিহির পরবর্তীকালে নিজে গল্প লেখার চেষ্টা করেন। প্রথম প্রয়াসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় মূলত যুদ্ধের গল্প লিখেছিলেন তিনি, যেটি হাতে লেখা একটি পত্রিকা 'শিখা'তে প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী সময়ে এক স্থানে লেখক তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখাটিকে 'নেহাৎ ছেলেমানুষী গল্প' বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] এর অনেক পরে, দেশভাগের ফলে তিনি যখন কলকাতায় এসে সিটি কলেজে ভর্তি হন, তখন প্রগতি লেখক সংঘের সাহিত্য আসরে যোগদান করে পুনরায় লেখার উৎসাহ ফিরে পান। সোমেন চন্দ লাইব্রেরির পত্র-পত্রিকা থেকে রসদ সংগ্রহ করে 'যুদ্ধোত্তর জার্মানী' শিরোনামে একটি 'রাজনৈতিক প্রবন্ধ'[৪] লেখেন তিনি। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'সত্যযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত (মার্চ ১৯৫০-এ) এই প্রবন্ধই মিহির মুখোপাধ্যায়ের ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত প্রথম লেখা। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্পের নাম 'শিল্পী' ('নতুন সাহিত্য', জুন ১৯৫০)। এই গল্প প্রকাশকালে লেখকের বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর। এরপর মিহির মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় হয় বিমল করের তরুণ লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে। এঁদের সাহচর্যে তিনি লেখায় বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিককেও গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। পেশায় অধ্যাপক (প্রথমে স্কুল শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন আরম্ভ করেন, পরে হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন) মিহির মুখোপাধ্যায় 'কালপুরুষ' (লীলা রায় সম্পাদিত 'জয়শ্রী' পত্রিকায় আনুমানিক ষাটের দশকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এবং ১৯৬৪ সালে 'বিদ্যাভারতী' প্রকাশনী থেকে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল)[৫], 'কণ্ঠভরা বিষ' (ভারতচন্দ্রের জীবন অবলম্বনে রচিত এই সুদীর্ঘ উপন্যাস 'জয়শ্রী'তে মে ১৯৬৬ থেকে এপ্রিল ১৯৭৪ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল), 'শঙ্খমালা' (প্রথম প্রকাশ: 'দেশ', অক্টোবর ১৯৭২; ১৯৭৩ সালে 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড' থেকে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়) এবং 'বিষুববৃত্ত' ('শিলাদিত্য', মার্চ ১৯৮৩) নামে চারটি উপন্যাস লিখলেও, ছোটগল্পই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণক্ষেত্র। এই প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য স্মরণ করা যায়—

> "ছোট গল্পই আমার নিজস্ব ভূমি। একটি ভাল গল্প লিখে যে আনন্দ পাই, বন্ধুদের শুনিয়ে যে তৃপ্তি পাই, অন্য কিছুতে তা হয় না।"[৬]

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে নব্বইয়ের দশক অবধি 'অগ্রণী', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'ঊষা', 'একতা', 'কথামালা', 'চতুরঙ্গ', 'জয়শ্রী', 'জলসা', 'দেশ', 'নতুন সাহিত্য', 'পরিচয়', 'বিভাব', 'মহানগর', 'লোকায়ত', 'শিলাদিত্য', 'সত্যযুগ', 'স্বদেশ ও শিল্প', 'সাপ্তাহিক বসুমতী' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রায় এক শত গল্প (ডায়ারির পৃষ্ঠায় নিজের লেখালেখির একটি কালানুক্রমিক তালিকা তৈরি করেছিলেন মিহির মুখোপাধ্যায়, যেখানে ৯৫টি গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। তালিকাটি পরবর্তীকালে রাহুল সেন সম্পাদিত 'বিভাব' পত্রিকার শরৎকালীন সংখ্যা ১৪১৯-এ সংযোজিত হয়। উদ্দিষ্ট সংখ্যার ক্রোড়পত্রের বিষয় ছিল মিহির মুখোপাধ্যায়) প্রকাশ পেলেও অদ্যাবধি মিহির মুখোপাধ্যায়ের কোনো গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়নি। এবার প্রভাত দেবসরকারের 'প্রত্যহের একদিন' এবং মিহির মুখোপাধ্যায়ের 'ঘরের কথা' গল্প দুটির আলোচনা করা যায়। প্রায় সমসময়ে প্রকাশিত পূর্বোক্ত গল্পদ্বয়ে প্রতিফলিত দৈনন্দিন সাধারণ গৃহজীবনের অসাধারণ প্রকাশ আমাদের বক্ষ্যমাণ আলোচনার মূল বিষয়।

১১ বৈশাখ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রভাত দেবসরকারের 'প্রত্যহের একদিন' গল্পটি। 'প্রত্যহের একদিন'— গল্পের এই নামকরণ থেকে এর বিষয় সম্পর্কে কিছুটা পূর্বধারণা পাওয়া যায়। বস্তুত গল্পের প্রধান চরিত্র সুকুমারের নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের একঘেয়ে, ক্লান্তিকর প্রাত্যহিকতা এবং সেই ছকবাঁধা জীবন থেকে ক্ষণিকের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এই গল্পের বিষয়। গল্পে দেখি, সুকুমারের পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মা সারদা এবং স্ত্রী চারুলতাকে নিয়ে তাদের সংসারের ভার সুকুমারের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। কাহিনি সূত্রে জানা যায়, সুকুমার একটি সওদাগরী অফিসের কর্মচারী। অফিসে ঠিক সময়ে পৌঁছানোর জন্য সে রোজ ভোরের পাঁচটা পঞ্চান্ন-র কালকাগামী ট্রেনের ওপর নির্ভরশীল। এইভাবে একাদিক্রমে দুই বছর যাবৎ "কেবল দুর্দমনীয় বাঁচার ইচ্ছায় আজ পর্যন্ত সে বর্ষা-বাদল, শীত-গ্রীষ্ম মাথায় করে পাঁচটা পঞ্চান্নর ট্রেন ধরে আসছে।"[৭] অন্যান্য দিনের মতো আজও তথা গল্পে উদ্দিষ্ট এক শীতের দিনে কাকডাকা ভোরে ঘুম ভাঙে সুকুমারের। লেপের উষ্ণ আরাম এবং স্ত্রীর বাহুবন্ধন থেকে 'প্রাত্যহিক কর্তব্যানুরোধে' নিজেকে মুক্ত করে তাকে বাধ্য হয়ে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 140 - 146
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিছানা ছাড়তে হয়, যা ব্যতিক্রমহীনভাবে সুকুমারকে যুগপৎ বিরক্ত ও অবসন্ন করে তোলে। কিন্তু বিরক্তি এবং অবসাদকে পাশে সরিয়ে রেখে তাকে রোজকার মতো স্নানের ঘাটে যেতে দেখি আমরা। এই অবসরে প্রতিদিনের ন্যায় সুকুমারের মা সারদা ছেলের জন্য রান্নার কাজ প্রায় শেষ করে আনেন। রান্নাঘরে মাকে দেখে সুকুমারের সংশয় হয় যে,

> "মায়েরও কি তার মত রোজ সাত-সকালে বিছানা ছাড়তে কষ্ট আর বিরক্তি হয়! চারুলতা এখন দিব্যি আরামে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে; ...পুত্রের এই বধূপ্রীতির জন্যে মা কি রোজ সকালে একবার বাবার কথা মনে করেন না?"[৮]

অর্থাৎ সুকুমারের মতো তার মায়ের জীবনও প্রাত্যহিক রুটিনে আবর্তিত হয় বলা যায়।

মায়ের চিন্তায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সুকুমার ঘাটের দিকে অগ্রসর হলে পুকুরপাড়ের আমবাগান দেখে তার মনে হয়, গাছগুলির ভোরের ট্রেন ধরবার কোনো তাড়া নেই। "মাটির বুকে জন্মে মাটির বুক আঁকড়ে ওদের জন্ম সার্থক হয়ে যাবে।"[৯] সময়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া নিজের ব্যস্তজীবনের সঙ্গে গাছগুলির অনড় অবস্থার তুলনার ফলে সুকুমারের এই অনুভব তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবং এর মধ্য দিয়ে তার প্রত্যহের রুটিনে বাঁধা, ধাবমান জীবনের ক্লান্তির দিকটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। অবার আমগাছের গুঁড়ির আড়ালে একটি শিয়ালকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মৃত্যুভয় সুকুমারকে যেভাবে আচ্ছন্ন করে সংশয় হয়, জীবনে প্রতিটি দিনের একইরকম পুনরাবৃত্তি কি তার মানসিক শক্তি এবং স্থির বুদ্ধির মূলে 'ঘুন' ধরিয়ে দিয়েছে? এই সন্দেহ সুকুমারের নিজেরও হয়। বস্তুত এইসকল চিন্তা এবং সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সময়ের হিসেব গুলিয়ে ফেলে সুকুমার। ঘাটে দাঁড়িয়েই সে শুনতে পায় স্টেশনে পাঁচটা পঞ্চান্নর কালকাগামী ট্রেন ঢোকার শব্দ।

দুই বছরের নিয়মানুবর্তীতায় এই প্রথম ছেদ পড়ে সুকুমারের। এই শিথিলতায় সুকুমারের মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। নিজের প্রাত্যহিকতায় নিয়মভঙ্গের ফলে আমরা সুকুমারকে বিশেষ উদ্বিগ্ন হতে দেখি না; বরং সে ট্রেন ধরতে না পারায় একপ্রকার নিশ্চিন্তই হয়। এবং অপরিকল্পিতভাবে অথচ ক্লান্তিকর, গ্লানিময় কর্মজীবনে কাঙ্ক্ষিত ছুটি পেয়ে যাওয়ায় সে যেন 'নবজীবন' লাভ করে। এই বিরতি তাকে উজ্জীবিত করে। এরই সঙ্গে সুকুমারের চারুলতার কথা মনে পড়ে। আজ পর্যন্ত কোনোদিন সুকুমার ট্রেন ফেল না করায় চারুলতা তার কাছে অভিযোগ করেছে। এই অনুযোগের নেপথ্যে যে চারুলতার স্বামী-সান্নিধ্যের অভীপ্সা নিহিত থাকে তা অনুধাবন করতে পারে সুকুমার। মনে মনে তাই সে আজ চারুলতাকে অবাক করে দেওয়ার সংকল্প নেয়।

দুঃস্বপ্ন দেখে চারুলতার জাগরণের মধ্য দিয়ে গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। ঘুম ভেঙে এবং তারও কিছুক্ষণ পর চারুলতাকে বারংবার ভোরের ট্রেনযাত্রী সুকুমারের কথা স্মরণ করতে দেখি আমরা। বিছানা ছেড়ে শিয়রের দিকের বন্ধ জানলাটি খুলতে গিয়ে তার মনে পড়ে, সুকুমার ভোরে উঠে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কোনোদিন এই জানলা খোলে না। খোলা জানলা দিয়ে ঘরে আলো প্রবেশ করে যাতে সকাল সকাল তার ঘুম না ভেঙে যায়, তাই স্বামীর এর বিশেষ সতর্কতা। এবং এই কথা মনে হতে চারুলতা আজই যেন তার প্রতি সুকুমারের ভালোবাসার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারে। এই উপলব্ধিতে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় তীব্র সুখানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়। তবে এই আচ্ছন্নতা ক্রমশ প্রশমিত হয়ে এলে চারুলতা যখন ভাবে যে, এরপর সে কী করবে বা স্বামীর অনুপস্থিতে সারাদিন সে কাকে নিয়ে সময় কাটাবে, তখন সুকুমারের পূর্বেকার একটি কথা মনে পড়ে চারুলতার—

> "একদিন কথায় কথায় সুকুমার বলেছিল, দেখ চারু, চাকরি নেবার পর থেকে আমার বন্দী জীবন শুরু হয়েছে! লোকে বলে বিয়ে করলে বন্ধন, আমার কিন্তু মনে হয় ঠিক তার উল্টো, আমাদের মত লোকের পক্ষে বিয়েটা মুক্তি।"[১০]

গল্পে দেখি, সুকুমারের উপলব্ধিজাত পূর্বোক্ত মন্তব্যটি আজ নিজের দিক থেকে অনুধাবন করতে পারে চারুলতা। সে বুঝতে পারে যে তার 'বন্দিনী জীবনে' সুকুমারের সান্নিধ্য তাকে রোজ মুক্তির আস্বাদ দেয়। এবং ঠিক এই কারণেই স্বামীর পথ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 140 - 146
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চেয়ে প্রতিদিনের প্রতীক্ষা চারুলতার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেনি কোনোদিন। তবে সুকুমারের সাহচর্য চারুলতাকে মুক্তির আস্বাদ এনে দিলেও অস্বীকার করা যায় না যে তার কর্মহীন, সুদীর্ঘ অবসরের দৈনন্দিন গৃহজীবনও আসলে প্রত্যহের পুনরাবৃত্তি এবং তা সুকুমার এবং তার মা সারদারই মতো বৈচিত্রহীন। সে যাই হোক, কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা যে চারুলতাকে তার প্রতি সুকুমারের ভালোবাসাকে স্মরণ করে খুশি হতে দেখেছিলাম কিংবা তারও আগে, ঘুম ভাঙার পর যার বারবার স্বামীর কথা মনে পড়ছিল, সেই চারুলতাকেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দালানে সুকুমারের জন্য বাড়া ভাতের থালা দেখে বিরক্ত হতে দেখি আমরা। বাস্তবিক মানব মনের গতি এমনই বিচিত্র যে সুকুমারের ভাতে চড়াই পাখিদের ভোজ এবং মাগুর মাছের ঝোলের বাটিতে পুরু সর পড়তে দেখে চারুলতা কেবল বিরক্তই হয় না; সুকুমারের কর্তব্যনিষ্ঠা এবং অফিসের প্রতি তার 'প্রগাঢ় অনুরাগে' সে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। এই একটি দৃশ্য বা ঘটনায় স্বামীকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত চারুলতার সুখানুভব পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে তার মনে হয়,

> "আশ্চর্য লোক, এত তাড়া যে অভুক্ত অবস্থাতেই আপিস ছুটলো! সময় যদি নাই ছিল, আজকে আপিস কামাই করলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত! এত নিষ্ঠা যে, মুখের অন্ন ছেড়ে ট্রেন ধরতে হবে? জীবনটা কি পাঁচটা পঞ্চান্নর ট্রেন যে একবার ফেল করলে মাটি হয়ে যাবে?"[১১]

দেখা যায়, উদ্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে নিয়ে চারুলতা একে তার প্রতি সুকুমারের উপেক্ষা বলে প্রতিপন্ন করে। এবং চারুলতা স্থির করে যে এর উত্তর সে সুকুমারকে দেবে।

দুই বছরে এই প্রথমবার অযাচিতভাবে হলেও অফিস কামাই করায় সুকুমার যেখানে স্ত্রী চারুলতাকে চমকে দেবে ভেবে মনে মনে উদ্দীপিত হয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে, সেখানে পূর্বোক্ত ঘটনায় বিরক্ত এবং নিজেকে উপেক্ষিত মনে করা চারুলতা সুকুমারকে প্রত্যুত্তর দেবে বলে ঠিক করেছিল— এ কথা আমরা আগেই বলেছি। বস্তুত সুকুমার এবং চারুলতার এই বিপ্রতীপ মনোভাব থেকে গল্পের তৃতীয় তথা অন্তিম পরিচ্ছেদের সূচনা হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর এই বিপরীত মনোভঙ্গি গল্পের পরিণতিকে ত্বরান্বিত করে বলা যায়। গল্পে দেখি, 'বহু আকাঙ্ক্ষিত, কিন্তু একান্ত অভাবিত' সুকুমারের প্রত্যাবর্তনে চারুলতা যেন প্রিয়জনের ভূত দেখার মতো আড়ষ্ট হয়ে যায়। এমনকী সে কোনো কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। স্ত্রীর এই নির্বাক, আড়ষ্টভাব নিরীক্ষণ করে সুকুমার বোকার মতো হেসে বলে, "...ইস ট্রেনটা এক সেকেণ্ডের জন্যে ফেল করলুম।"[১২] এক্ষেত্রেও চারুলতা নির্বিকার থাকে। এবং পরক্ষণে সুকুমারের ভাতের থালাটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে ঘরে চলে যায় সে। গল্পে পাই, সুকুমারের প্রত্যাগমনে চারুলতার এই নিরুৎসাহ, তার ভাবলেশহীন আচরণ দেখে সে ভাবে, আজ অফিস কামাই করায় সে প্রথমে যতটা খুশি হবে ভেবেছিল, এখন তা সে হতে পারছে না। এখন বরং অফিস কামাইয়ের কষ্টটা বিঁধতে থাকে সুকুমারের মনে। বাস্তবিক সুকুমার ও তার পরিবারের দুই বছরের নিয়মানুবর্তী, একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর প্রাত্যহিক জীবনে আজকের দিনটি যেখানে বিশেষ বা ভিন্নরকম হয়ে উঠতে পারত, তা সুকুমার ও চারুলতার পৃথক মনোভাবের কারণে প্রত্যহেরই একটি দিনে পর্যবসিত হয়। গল্পের সমাপ্তি তাই ধূসর এবং 'মনোটোনাস'। এবার পরবর্তী গল্পের আলোচনায় অনুপ্রবেশ করা যায়।

"শিবলার বউ যমুনা ভর সন্ধ্যেবেলা এক ডেলা আফিম খেল।"[১৩] — পাঠককে এই চমকপ্রদ তথ্য প্রদানের মধ্য দিয়ে সংবাদ পরিবেশনার ভঙ্গিতে 'ঘরের কথা' গল্পটি আরম্ভ করেছেন মিহির মুখোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, ছোটগল্পের 'সূচনা' সম্পর্কে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বলেছেন,

> "ছোটগল্পের 'সূচনা' হল সেই অংশ যা দিয়ে গল্পটি সূচিত হয় এবং যেখানে গল্পকারের সঙ্গে গল্পপাঠকের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ...এই সূচনাতেই গল্পকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর পাঠকের আগ্রহ (reader's interest) জাগিয়ে তোলেন এবং পাঠককে তাঁর গল্পের মূলসুর (key note)টুকুও ধরিয়ে দেন।"[১৪]

বাস্তবিক 'ঘরের কথা' গল্পের সূচনায় উল্লিখিত যমুনার আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই গল্পের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। সাতগাছি গ্রামের শিবলা ওরফে শিবলাল পেশায় একজন ভ্যান-রিকশা চালক। গল্পের শুরুতে স্ত্রী যমুনাকে বাঁচানোর

প্রচেষ্টায় নিজের ভ্যানে চাপিয়ে তাকে ছোটো ভাই শ্যামলাল, জ্যাঠতুতো দাদা গোবিন্দ এবং গোবিন্দর বন্ধু বলাইয়ের সহায়তায় বারাসত হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেখি আমরা। গল্পসূত্রে জানা যায়, সাতগাছি থেকে বারাসত হাসপাতালের দূরত্ব প্রায় আট মাইল। উপর্যুপরি কার্তিক মাসের অকাল বর্ষণে গ্রামের কাঁচা রাস্তা কর্দমাক্ত হওয়ায় গন্তব্যে পৌঁছাতে তাদের দুই ঘণ্টা সময় লাগবে বলে অনুমিত হয়। বস্তুত যাত্রাপথের এই দুই ঘণ্টার অবকাশে কাহিনিকে অংশত অতীতমুখী করে কৌশলে যমুনার স্বভাব-প্রকৃতি, শিবলাল এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে তার সম্পর্কের সমীকরণ এবং যমুনার আত্মহ্যার প্রচেষ্টার কারণ বর্ণনা করেছেন গল্পকার। গল্পে সর্বজ্ঞ কথকের দৃষ্টিকোণ থেকে যমুনার চেহারার বর্ণনা পাই এভাবে—

> "আঠারো বছরের আঁটোসাঁটো গড়ন যমুনার। সরু কোমর ...একপিঠ কোঁকড়া চুল ...রঙ শ্যামলা বটে কিন্তু মুখখানি ভারী মিষ্টি। সামান্য চাপা নাক টানা টানা চোখ ভুরু।"[১৫]

যমুনার এই সৌন্দর্য দেখে মুখ্যত শিবলালের মা যমুনাকে পছন্দ করে পুত্রবধূরূপে বাড়িতে এনেছিলেন। গল্পে পাই, যমুনা বেশ অবস্থাসম্পন্ন ঘরের আদুরে মেয়ে। ঘরকন্নার কাজে খাটাখাটনিতে সে অভ্যস্ত নয়। মূলত সংসারের কাজকর্মে যমুনার অনীহা নিয়েই বিবাদ সৃষ্টি হয় শাশুড়ি ও পুত্রবধূর মধ্যে। এবং পরিস্ফুট হয় যমুনার 'ঝগড়াটে' স্বভাব। তবে শুধু শাশুড়ির সঙ্গেই নয়; ছোটো দুই ননদ টুনি-পুঁটির সঙ্গে বনিবনা হয় না তার। ঘরের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ নিয়ে শাশুড়ি-ননদদ্বয়ের সঙ্গে প্রত্যহের ঝগড়া ও অশান্তিতে অতিষ্ট এবং বিরক্ত যমুনা বিবাহের ছয় মাসের মধ্যেই শিবলালকে নিয়ে পৃথক সংসারের ইচ্ছে প্রকাশ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে শিবলালকে দ্বিধা করতে দেখি করতে আমরা। আসলে বিধবা মা, ছোট ভাই, বিবাহযোগ্য দুই বোন এবং পার্শ্ববর্তী জ্যাঠামশাইয়ের পরিবার (যদিও তাঁদের 'হাঁড়ি আলাদা'), যে জ্যাঠামশাই শিবলালের পিতৃবিয়োগের পর বহুদিন তাদের পরিবারের দেখাশোনা করেছিলেন, তাঁদেরকে পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় না শিবলালের পক্ষে। এবং এর মধ্য দিয়ে শিবলাল ও তার জ্যাঠামশাইয়ের পরিবারের পারস্পরিক আন্তরিকতার দিকটি পরিস্ফুট হয়। এই মানবিকতার দৃষ্টান্ত আমরা পরেও লক্ষ করব; আপাতত এখানে বলা যায়, দিনের বেলা শিবলালের বিচার-বুদ্ধি, উচিত-অনুচিত জ্ঞান ঠিক থাকলেও রাত্রে যমুনার মোহিনী রূপ, যা সাজসজ্জায় আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, তার স্থির বিবেচক মনকে অস্থির করে তোলে—

> "রাত্তিরে শুতে যাবার আগে আরেক প্রস্থ সাজগোজ করে যমুনা। চোখে কাজল, পানের রসে ঠোঁট লাল। নরম শরীর, নিটোল বুক। শিবলার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরে যায়। লণ্ঠনের হলুদ আলোয় কেমন নেশার মতো লাগে।"[১৬]

স্বামীর ঠিক এই সংরাগঘন দুর্বল মুহূর্তটিতে শাশুড়ি এবং দুই ননদ সম্পর্কে নিজের অভিযোগের কথা বলে যমুনা। অভিমান করে তাকে ঝিকড়ায় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলে শিবলালকে। গল্পে দেখি, দরমার বেড়া দেওয়া টালির ঘরে রাত্রিবেলা যমুনার উচ্চকিত কণ্ঠের এইসকল কথাবার্তা পাশের ঘরে শায়িত শিবলালের মা এবং দুই বোন কিছু কিছু শুনতে পায়, যার সূত্র ধরে পরদিন আরো অশান্তি লাগে সংসারে। কোনোরকম শিষ্টাচারের তোয়াক্কা না করে শিবলালের মা পুত্রবধূকে তুইতোকারি করে 'বর-ভোলানি', 'ঘর-জ্বালানি' বলে সম্বোধন করলে দু'জনের মধ্যে 'তুলকালাম কাণ্ড' বেধে যায়। মা এবং স্ত্রীর মধ্যেকার এই ঝগড়া, অশান্তি শিবলালের ঘরের রোজকার কথা।

অন্যান্য দিনের মতো গল্পে উদ্দিষ্ট দিনটিতে সকালবেলা ব্যতিক্রমহীনভাবে যমুনা এবং তার শাশুড়ির মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এবং এই নিয়ে দুপুরে শিবলালের সঙ্গে যমুনার বিবাদ হলে যমুনা উত্তর করে, "বেশ, ঠিক আছে, আমার মরা মুখ দেখবে তুমি।"[১৭] বস্তুত এই শেষ কথাটিকেই শিবলালের জ্যাঠামশাইয়ের জর্দার কৌটো থেকে আফিম নিয়ে খেয়ে প্রায় সত্যি করে তোলে যমুনা। এইভাবে কাহিনিকালের ধারাবাহিকতায় বিপর্যাস ঘটিয়ে, আখ্যানের 'পশ্চাৎ-উদ্ভাস (flash black)'[১৮] পদ্ধতির মাধ্যমে যমুনার আফিম খাওয়ার কারণ উদ্‌ঘাটিত করে গল্পকে বর্তমানকালের পটভূমিতে নিয়ে এসেছেন (সমালোচকের ভাষায় এই পদ্ধতিকে 'পূর্ব-উদ্ভাস' বা flash forward বলা হয়)[১৯] গল্পকার। গল্পে দেখি, শিবলাল জানে যে আফিম খাওয়া রোগীর পক্ষে ঘুম অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং প্রাণঘাতী। তাই হাসপাতাল পৌঁছানোর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যমুনাকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 140 - 146
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জাগিয়ে রাখার জন্য তাকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে দেখি আমরা। শিবলাল যমুনার নাম ধরে ডেকে, কখনো তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে কিংবা নিজের দুই আঙুল দিয়ে যমুনার চোখের পাতা খুলে রাখার মধ্য দিয়ে এমনকী প্রয়োজনে চিমটি কেটে বা চড় মেরে স্ত্রীকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করে। শিবলালের আঘাতে যমুনা আচ্ছন্ন এবং প্রায় অচেতন অবস্থায় মুখ দিয়ে যন্ত্রণাকাতর শব্দ করলে আমরা শিবলালকে পরম মমতায় স্ত্রীকে বুকে টেনে নিয়ে তার গালে, কপালে স্নেহভরে চুম্বন করতে দেখি। এক্ষেত্রে দাদা গোবিন্দ এবং তার বন্ধু কিংবা ভাই শ্যামলালের উপস্থিতি নিয়ে তাকে সংকুচিত হতে দেখি না। এখানে যমুনার গুরুত্বই তার কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি বলে প্রতিভাত হয়। যমুনার এই প্রাণসংকটে শিবলালের মানসিক অবস্থা লক্ষণীয়—

> "শিবলার বুকের মধ্যে কেমন করে। নিজেরই এখন কান্না পাচ্ছে। নিজেরই গালের মধ্যে এখন ঠাসঠাস করে চড় মারতে ইচ্ছে করছে। ...যমুনা যদি মরেই যায়, তাহলে কার জন্য এই খাটাখাটুনি, কিসের ঘর-গেরস্থালি। সব শূন্য হয়ে যাবে শিবলার। সব ফাঁকা। সামনের ওই রাস্তাটার মত ফাঁকা আর অন্ধকার।"[২০]

শিবলালের এই মানসিক প্রতিক্রিয়া যমুনার প্রতি তার প্রগাঢ় ভালোবাসার দিকটিকে উন্মোচিত করে আমাদের কাছে।

যমুনাকে নিয়ে সকলে বারাসত হাসপাতালে পৌঁছালে উদ্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে ডাক্তারবাবুর প্রাসঙ্গিক কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর যমুনার চিকিৎসা আরম্ভ হয়। শিবলাল আকুলভাবে ডাক্তারবাবুকে যমুনা বাঁচবে কিনা প্রশ্ন করলে, তিনি বারো ঘণ্টার পূর্বে কিছু বলা সম্ভব নয় জানিয়ে তাদের বাইরে গিয়ে বসতে বলেন। স্ত্রীর প্রাণসংশয়ের চিন্তায় শিবলাল যেখানে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, সেখানে 'ঠাণ্ডা মাথার হুঁশিয়ার লোক'[২১], শিবলালের জ্যাঠতুতো দাদা গোবিন্দর সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করার মতো। স্ত্রীর বিপন্ন অবস্থায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা সম্পর্কে বীতরাগ শিবলালকে বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসার কথা বলে গোবিন্দ। কিন্তু শিবলাল যমুনাকে ফেলে কোথাও যেতে রাজি না হলে দেখা যায়, গোবিন্দ তাকে চা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে। শুধু তাই নয়, শিবলাল যাতে চিকিৎসাধীন যমুনাকে অন্তত দরজার বাইরে থেকে দেখে আসতে পারে, তার জন্য গোবিন্দর তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এমনকী এক সময় বাড়ি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে সে অভুক্ত ভাইয়ের জন্য অ্যালুমিনিয়ামের কৌটোয় করে আটার রুটি, আলুভাজা এবং আখের গুড় নিয়ে ফিরে আসে। শিবলাল এবং তার পরিবারের বিপদে গোবিন্দর এই আন্তরিক সহমর্মিতা 'ঘরের কথা' গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

এরপর গল্প ক্রমশ অগ্রসর হয়ে সমাপ্তির দিকে এগোলে দেখা যায়, যমুনার মধ্যে বাঁচার ইচ্ছে প্রবল হয়ে ওঠে এবং বিপন্মুক্ত হয়ে সে বেঁচেও যায়। গল্পে দেখি, হাসপাতালের নির্দেশ মতো পরদিন বিকেলে সকলের সঙ্গে শিবলালের মা এবং দুই বোন যমুনাকে দেখতে আসে। পরস্পরকে দেখে তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলে সর্বজ্ঞ কথক বলেন, 'চোখের জল বড় পবিত্র। চোখের জলে সব ময়লা মুছে যায়।'[২২] বাস্তবিক যে যমুনা শাশুড়ির সঙ্গে প্রত্যহের ঝগড়ায় অতিষ্ট হয়ে পৃথক সংসার করতে চেয়েছিল, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে এখন আমরা তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে বলতে দেখি শিবলালের মাকে। অন্যদিকে শিবলালের মা ইতিপূর্বে যমুনাকে 'বর-ভোলানি', 'ঘর- জ্বালানি' বলে সম্বোধন করলেও, পুত্রবধূকে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে পেয়ে তাকে 'ঘরের লক্ষ্মী' বলে অভিহিত করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। ইতিমধ্যে শিবলাল গোবিন্দর পরামর্শ মতো 'ঘরের কথা' যাতে যমুনা বাইরে প্রকাশ না করে সেই ব্যাপারে সচেতন করতে এলে দেখা যায়, যমুনা বলে, "থাক তোমাকে আর শিখুতে হবে না, যাও তো এখান থেকে, আমি মায়ের সঙ্গে দুটো কথা বলি।"[২৩] এরপর শাশুড়ির 'শির-ওঠা' হাতের ক্ষয়াটে আঙুলগুলি আঁকড়ে ধরে যমুনা। বস্তুত এই আন্তরিকতা এবং মানবিক আবেদনের মধ্য দিয়ে আশাব্যঞ্জকভাবে গল্প শেষ করেছেন মিহির মুখোপাধ্যায়।

প্রভাত দেবসরকারের 'প্রত্যহের একদিন' এবং মিহির মুখোপাধ্যায়ের 'ঘরের কথা' গল্প দুটি আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, চরিত্র নির্মাণের নিপুণতায়, সাধারণ জীবনের বাস্তবোচিত ও অনুপুঙ্খ বিবরণে এবং প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক 'টেকনিক'-এর ব্যবহারে আমাদের আলোচ্য অগ্রন্থিত ও বিস্মৃতপ্রায় গল্পদ্বয় হয়ে উঠেছে সাধারণ গৃহজীবনের এক অসাধারণ আখ্যান।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 140 - 146
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. চৌধুরী, কমল, (সম্পাদিত) অমৃত গল্পসম্ভার, পত্রভারতী, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ৩১০
২. ক. কর, বিমল, আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৯২, পৃ. ১৬২ (অশোক দাস কৃত লেখক-পরিচিতি দ্রষ্টব্য)
খ. মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ও বসু, সমরেশ, (সম্পাদিত) ১৫০ বছরের শ্রেষ্ঠ গল্প স্ব-নির্বাচিত গল্প, ১ম খণ্ড, মডেল পাবলিশিং হাউস, পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ: কলকাতা বইমেলা, ১৯৯৭, পৃ. ৭৯১
৩. মুখোপাধ্যায়, মিহির, আনন্দ আমার, সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত) দেশ পত্রিকা, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃ. ১০৪
৪. তদেব।
৫. সেন, রাহুল, (সম্পাদিত) বিভাব পত্রিকা, ক্রোড়পত্র: মিহির মুখোপাধ্যায়, শরৎকালীন সংখ্যা, ১৪১৯, পৃ. ২৭২ (মিহির মুখোপাধ্যায়ের ‘রচনাপঞ্জি’ অংশ দ্রষ্টব্য)
৬. মুখোপাধ্যায়, মিহির, পূর্বোক্ত আনন্দ আমার, পৃ. ১০৫
৭. দেবসরকার, প্রভাত, প্রত্যহের একদিন, দেশ পত্রিকা, ১১ বৈশাখ ১৩৮৩, পৃ. ৯২২
৮. তদেব, পৃ. ৯২১
৯. তদেব, পৃ. ৯২২
১০. তদেব, পৃ. ৯২৭
১১. তদেব
১২. তদেব, পৃ. ৯২৮
১৩. মুখোপাধ্যায়, মিহির, ঘরের কথা, দেশ পত্রিকা, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩, পৃ. ৩৮১
১৪. শাশমল, অতনু, প্রসঙ্গ ছোটগল্পের সূচনা ও সমাপ্তির প্রকরণগত বিশেষত্ব এবং গুরুত্ব, বসন্ত পাল (সম্পাদিত) পৌরদিশারী, ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৯১, পৃ. ৩২
১৫. মুখোপাধ্যায়, মিহির, পূর্বোক্ত ঘরের কথা, পৃ. ৩৮১
১৬. তদেব
১৭. তদেব, পৃ. ৩৮৪
১৮. দাস, অমিতাভ, আখ্যানতত্ত্ব, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম দে’জ সংস্করণ, আগস্ট ২০১৯, পৃ. ৪১
১৯. তদেব
২০. মুখোপাধ্যায়, মিহির, পূর্বোক্ত ঘরের কথা, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫
২১. তদেব, পৃ. ৩৮৩
২২. তদেব, পৃ. ৩৯১
২৩. তদেব